বাসনকোশনের কথা

স্বপন কুমার ভট্টাচার্য

আমাদের শহরে লোকসংস্কৃতির অনেক গুণী গবেষক আছেন। নিতান্ত অর্বাচীন কেউ অপটু হাতে ঐ বিষয়ে নাড়াচাড়া করতে গেলে সঙ্গত কারণে তাঁরা কুপিত হতে পারেন। সেজন্য আগেই বলে নেওয়া ভালো, আমি লোকসংস্কৃতির গবেষক নই, লেখক আদৌ নই, এমনকি পাঁড় পাঠকও নই। সংসারের অন্নদাস। আড্ডায় নিয়মিত রাজা- উজির নিধন করি। বক্ষ্যমান বিষয়ে আড্ডায় একদিন কথা হয়েছিল। সেই সূত্রেই এই অকিঞ্চিৎকর নিবন্ধের অবতারণা। আমার চলাফেরার ক্ষুদ্রগন্ডির মধ্যে যা দেখেছি বা শুনেছি সেই সূত্রেই আলোচনা।

বাসনকোশন নিয়ে কথা। রাজা মহারাজারা শুনেছি রূপোর থালা, সোনার বাটিতে খাওয়া-দাওয়া করত। অনেক ধনী পরিবারের উৎসবে অনুষ্ঠানে, গৃহদেবতার নৈবেদ্য সাজাতে রুপোর থালা বাসন ব্যবহার হত বা এখনও হয়। অন্য সময়ে তাঁরাও পিতল কাঁসার বাসন ব্যবহার করতেন। সাধারণ মধ্যবিত্ত বা গরিব গৃহস্থও বাসন বলতে পিতল কাঁসার বাসন বোঝাত। গরিব মানুষের কাছে পিতল, কাঁসার বাসনের মতো অস্থাবর সম্পত্তির আলাদা গুরুত্ব ছিল। এটা ছিল এক ধরনের বিনিয়োগ। হঠাৎ দরকার হলে বিপদে - আপদে থালা-ঘড়া, ঘটি-বাটি দিয়ে নগদ টাকার জোগাড় হত। ফুল্লরা এত গরিব ছিল যে 'আমানি' খাবার মতো বাসনও তার ঘরে ছিল না– 'আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান।' মাটির মেঝের গর্তে কী করে আমানি ঢেলে খেত ব্যাধ দম্পতি ভাবা যায় না।

গ্রামের নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান হওয়ার আশৈশব, ১৯৪৫-৫৫ সাল থেকে, দেখে আসছি পিতল-কাঁসার বাসন খাওয়া, ভাত রান্না মাটির হাঁড়িতে, তরকারি লোহার কড়াইয়ে। টক জাতীয় কিছু রাখার জন্য পাথরের বাটি। পরিমাণ বেশি হলে পাথরের খোরা। 'খোরা' বোধহয় বর্ধমান - হুগলির আঞ্চলিক ভাষা। গ্রামাঞ্চলে খোরা এখনও বাতিল না-হলেও শহরে বর্তমান প্রজন্মের কাছে প্রায় অপরিচিত। পাথরের বাসন এখনও ঠাকুর পুজোয় ব্যবহার হয়। গ্রীষ্মকালে শ্বেতপাথরের গ্লাসে শরবত পান রীতিমত অভিজাত ব্যপার। গ্রামাঞ্চলে এখন আর তথাকথিত অভিজাত পরিবার নেই। অভিজাত প্রথা নেই। বড়ো শহরে হয়তো কোনো কোনো পরিবারে ঐসব সাবেকি অভ্যাস বজায় থাকলেও থাকতে পারে।

আর ছিল এনামেলের বাসন– লোহার উপর পোর্সেলিন জাতীয় কিছুর আস্তরণ দেওয়া। টক জাতীয় খাদ্য কোনো বিক্রিয়া করে না, আবার পরিস্কার করাও সহজতর। কারণ জানি না, কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায়কে এনামেলের বিভিন্ন ধরনের বাসন বেশি ব্যবহার করতে দেখেছি। স্টেনলেস স্টিলের প্রভাবে এনামেল বেশ কোণঠাসা হয়ে পড়েছে মনে হয়। হাসপাতালে বা রোগীদের জন্য এনামেলের ব্যাপক ব্যবহার ছিল। পরিবর্তে এখন পলিথিন বা স্টেনলেস স্টিলের পাত্র ব্যবহৃত হচ্ছে। দাম তুলনায় অনেক কম।

অল্প বয়সে দোতলার মেলায় গিয়ে দিদিমার নির্দেশমাফিক মাটির হাঁড়ি, যে কটা হাতে বয়ে আনা সম্ভব, কিনে এনেছি। বলে দেওয়া হত 'সিউরেল' নামক গ্রাম থেকে আসা কুমোরের হাঁড়ি কিনতে হবে। বাজিয়ে দেখতে হবে 'টং' 'টং' শব্দ হচ্ছে কিনা। বিশেষ কোনো গ্রাম থেকে আসা হাঁড়ি নাকি ঢ্যাপ ঢ্যাপ– সহজে ফেটে যায়। তবে প্রত্যুহের জলগ্রহণে আগে আপনি এলাকার কিপ্টেতম ব্যক্তির মুখদর্শন করবেন বা নাম করে বসবেন বা এ-ব্যাপারে নিষিদ্ধ কোনো গ্রামের নাম করে বসবেন অথচ হাঁড়ি ফাটবে না এমন নিশ্চয়তা কেউ দিত না। বর্ধমান - হাওড়া কর্ড লাইনে এখনও কেন একটি স্টেশন মাঝেরগ্রাম বলে উল্লেখিত হয় খোঁজ নিলেই জানা যাবে।

আদিবাসী মেয়েরা একসঙ্গে ছ-সাতটা হাঁড়ি সাজিয়ে একটা শাড়িতে বেঁধে মাথায় করে নিয়ে যেত মেলাতলা থেকে। মুড়িভাজার খোলাও কিনে আনা হত। কাঠের বা তুঁষের জ্বাল দিয়ে যাতে চাল 'ওঁজা' হত। চাল 'ওজাঁ' সম্পূর্ণ হলে লোহার কড়াই বা মাটির কড়াই সদৃশ পাতের বালির উপর ভেজে মুড়িতে রূপান্তরিত করে নারকেল কাঠের খুঁচি দিয়ে চুলে নেওয়া হত। হাঁড়ির আকার অনেক বড়ো। কিছুটা লম্বা আকৃতি হয়ে নাম হত 'হাঁড়া' বা 'জালা'। অনেককাল আগে এই ধরণের মাটির হাঁড়াতে গুড়, ঘি সংরক্ষিত হোত– তখন তার নাম হত 'মটকী', মাঝারি আকৃতির জালা বা হাঁড়াতে খই, মুড়ি, তেঁতুল রাখা দেখেছি। এখনও গাঁয়ে-গঞ্জে মিষ্টির দোকানে, পাইস হোটেলে জল রাখার জন্য জালার ব্যবহার লুপ্ত হয়নি। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এখনও মাটির বাসন– সরা, মালসা, ধুনচি, ঘটের ব্যবহার বন্ধ হয়নি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য গৃহস্থের হেঁসেলের নিত্য ব্যবহার্য মাটির বাসন– হাঁড়ি - কুড়ি অশৌচান্তে ফেলে দিতে হত। জন্মসূত্রে অশৌচ– আনন্দ বাঁশতলা বা পতিত জায়গায়। সে জায়গাকে বলা হোত 'হাঁড়ি-কুড়ি ভেঙে টুকরো হয়ে ছড়াছড়ি হয়ে গেলে তাই নিয়ে ডোবা পুকুরের জলে ছিনিমিনি বা ব্যাঙবাজি খেলায় নিষেধের তোয়াক্কা করা হত না। টুকরোগুলো নাম হত ' খোলামকুচি', 'খাট্ট'ও বলা হত।

আমাদের শৈশবে অ্যালুমিনিয়মের বাসন বাজারে এলেও অন্তত গ্রামের দিকে বহুল প্রচলিত ছিল না। কিন্তু ক্রেতার কাছে তা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সহসা ভেঙে-ফেটে যায় না, মেজে নিলেই শুদ্ধ, আবার টেকসইও বটে। দাম পাওয়া যায়। অ্যালুমিনিয়াম বাজারে এসে মাটির হাঁড়ি কলসির বাজার নাশ করেছে। যেটুকু ছিল আশির দশকের পর প্লাস্টিকের ব্যাপক ব্যবহার তারও দফা সেরেছে। এখন প্রত্যন্ত গ্রামেও মাটির সরায়, শালপাতা বেঁধে কাউকে মিষ্টি হাতে যেতে দেখা দুর্লভ দৃশ্য। বর্ষার কাদার রাস্তায় একহাতে জুতো-জোড়া, অন্য হাতে মিষ্টির সরা, কোমরে কোঁচা গোঁজা শ্বশুরবাড়িমুখো জামাই আর দেখা যাবে না।

আপাত নাস্তিক্যবাদীরা দীর্ঘ তিন যুগ রাজত্ব করে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে লঙ্কাকান্ড ঘটালেও ধর্মক্ষেত্রে তেমন সুবিধা করে ওঠা যাবে না বুঝতে পেরে জনসংযোগের মাধ্যম হিসাবে বারোয়ারি পুজোয় অংশ নিতেন। আস্তিক্যবাদীদের ভগবদ্ভক্তি বা ভগবদ্ভীতি স্বাভাবিক, পুজোয় ব্যবহার্য বাসনে কিন্তু তেমন পরিবর্তন ঘটেনি– লক্ষণীয়। কালধর্মে অনুসরণ করে বাহ্যিক আড়ম্বর ধর্মনিষ্ঠাকে চাপা দিলেও পুজো-অর্চনায় তামা বা পিতলের রেকাবি, পুষ্পপাত্র, পিলসুজ, পঞ্চপ্রদীপ, ঘন্টা, কোশাকুশি ইত্যাদি চিরাচরিতভাবে ব্যবহার হয়ে আসছে আর্থিক অবস্থা নিরপেক্ষভাবে। অ্যালুমিনিয়াম স্টিল - পোরসেলিনের বাসন ঠাকুর ঘরে তেমন অনুপ্রবেশ করতে পারেনি এখনও তবে বাসনচোরেরা এ-ব্যাপারে 'ফেসিলিটেটরের'

ভূমিকা যথেষ্ট সক্রিয়। ঠাকুরের ভোগ রান্না এখনও পিতলের হাঁড়িতেই হয়ে থাকে। যাঁরা যুক্তিবাদী আন্দোলন করেন তাঁর খেয়াল করলে হয়তো অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়িতে ভোগ রান্না করার জন্য আন্দোলন করতে পারেন। আড্ডার একজন প্রগতিশীল বন্ধু প্রতিবাদ করে বললেন, পিতলের রেকাবির জায়গায় স্টেনলেস স্টিলের রেকাবি আস্তে আস্তে চালু হচ্ছে। যাইহোক এই পিতলের হাঁড়ি যখন অনেক বড়ো হয়ে যগ্যিবাড়ির পোলাও বিরিয়ানি রান্নার আকারের হয় তখন নাম হয়ে যায় 'হান্ডা'।

পুজো-অর্চনায় কাঠের বড়ো থালা যার নাম 'বারকোশ' এখনও ব্যবহার হয়। মফস্‌সলের মিষ্টির দোকানে বারকোশের ব্যবহার হয়, ময়দা বা ছানা ঠাসার সুবিধা হয় বলে।

বিবাহ, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি মাঙ্গলিক অনুষ্টান বা শ্রাদ্ধকর্মের দানে উপহারে পিতল, কাঁসার বাসনের গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। অন্নপ্রাশনে মামার বাড়ি থেকে দেওয়া রঙিন চেলি পরে, কপালে চন্দনের ফোঁটা নিয়ে, মাথায় মুকুট পরে কাঁসার থালা-বাটিতে পঞ্চব্যঞ্জন দিয়ে শিশুর মুখে প্রথম অন্ন দেওয়া হবে। এই প্রথার তেমন পরিবর্তন না-হলেও শহুরে হাওয়া লাহ্রগ পরিবারে বিয়ের দানে বাসন এখন নিছক ঝামেলা হিসাবে প্রায় বর্জিত। খরচও মন্দ নয়। প্রথা অনুযায়ী তালিকা ধরে বিয়ের দানের খরচ সাত থেকে দশ হাজার টাকা। এ-হিসাব একটি বাসনের দোকানের। তরুণ কংসবণিক, দোকান মালিক, তাঁদের জাত ব্যবসা বাসনের, জানালেন নিজের বিয়েতে পাওয়া দানের বাসন তাঁর দোকানে বিক্রি করে মেয়ের বিয়েতে ফ্রিজ কিনে দিচ্ছে। তাঁর সঙ্গেই কথা বলে জানতে পারলাম পিতল-কাঁসার বাসনের ব্যবসা তথা শিল্পের প্রধান পৃষ্ঠপোষক এখন গ্রামের সাধারণ মানুষ, চাষি, গরিব গৃহস্থরা। সৌভাগ্যক্রমে সেই সংখ্যা যথেষ্ট বেশি হওয়ায় শহুরে, শিক্ষিত আধুনিক রুচির ফ্ল্যাট-সংস্কৃতি অনুরাগীরা মুখ ফিরিয়ে নিলেও বাসনের ব্যবসা তেমন সংকটের মুখে এখনও পড়েনি। কাউকে দোষারোপ করেও লাভ নেই। সাত - আটশো বর্গফুট মাপের বাসস্থানে অতিরিক্ত কোনো কিছুর ঠাই নে। অনেক ক্ষেত্রে তাই মা-বাপও ঠাইনাড়া হয়ে যাচ্ছে। পুকুর ডোবার ঘাটে ছোবড়া -তেঁতুল দিয়ে আচ্ছা করে না - মাজলে পিতল কাঁসার বাসনের ছিরি ফেরে না। শহরে আর ডোবা পুকুর কোথায়! যা আছে তাও আশপাশে গড়ে ওঠা, অপরিকল্পিতভাবে বাড়ির নর্দমার জলে নরককুন্ড হয়ে আছে। আবার পাঁচ-সাত বাড়ি কাজ করা ঠিকে মেয়ের এখন সময় নিয়ে ঘষে ঘষে পিতল কাঁসার বাসন মাজার অবকাশ কোতায়! কাজেই উত্তরাধিকারসুত্রেপ্রাপ্ত বাসন বিক্রি করে কেউ ঝামেলা মুক্ত হয়েছেন, কেউ বা বস্তাবন্দি করে তুলে রেখেছেন।

কালক্রমে মানুষের অভ্যাসেরও পরিবর্তন হয়। বাড়িতে অতিথি-আত্মীয়-স্বজন এলে হাতমুখ ধোয়ার জন্য গাড়ুতে জল এবং গামছা দেওয়া ছিল প্রথম কর্তব্য। এখন সে-প্রথা লুপ্তপ্রায়। মুসলমান সম্প্রদায় এ-বাবদ বদনা ব্যবহার করেন। গাড়ুর মতো বদনা লুপ্তপ্রায় না-হলেও সেখানে প্লাস্টিকের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। কোনো কোনো রাজ্যের লোক নাকি শুধু লোটা-কম্বল নিয়ে এ রাজ্যে ভাগ্যান্বেষনে এসে বড়োলোক হয়েছে এমন শোনা যায়। আর যাই হোক, দৈনন্দিন জীবনে লোটা বা ঘটির গুরুত্ব এতে বোঝা যায়। রান্নার জায়গায় ঘটির অনুপ্রস্থিতি অকল্পনীয় ছিল। এখন আর হেঁসেলে ঘটির ব্যবহার হয় না বললেই চলে। গ্রামের দিকে একেবারে বন্ধ না-হলেও আধুনিক হেঁসেলে ঘটি অপাঙতেয়। যগ্যিবাড়িতে পিতলের 'জগ' থেকে মাটির গ্লাসে জল পরিবেশন করা হত। এখন পলিথিলেন গ্লাসে জল দেওয়া হয় পলিথিলেন 'জগ' থেকে। শহরে এখন জলের বোতল বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অনেক গৃহস্থবাড়ির খাবার টেবিলেও গ্লাস নির্বাসিত হয়ে বোতলের ঠাঁই হয়েছে। কিন্তু এই পরিবর্তনের যুগেও সব সহরে বেশ কিছু বাসনের দোকান ব্যাবসা করছে। গ্রামে-গঞ্জে বহু মানুষ এই পিতল, কাঁসার বাসন তৈরির কুটির শিল্পে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। পুরুষানুক্রমে যারা পিতল কাঁসার বাসন তৈরি করত তারা কাঁসারি বলে পরিচিত ছিল। এখন কিন্তু ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মুসলমানসহ অন্য সম্প্রদায়ের মানুষও এই শিল্পে সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছেন– এমনও দেখা যাচ্ছে।

কাটোয়ার পূর্বে, গঙ্গার অপর পাড়ে নদীয়া জেলার মাটিয়ারীতে বিখ্যাত মোকাম। এখানে তৈরি হয় গামলা, বালতি, হাঁড়ি, জগ। গঙ্গার পশ্চিম তীরে কাটোয়া দাঁইহাটে তৈরি হয় ঘড়া। সে ঘড়ার আরও অনেক প্রকারভেদ; সর্বাঙ্গসুন্দর ঘড়া, জাঁবুই ঘড়া, শ্যামলী ঘড়া ইত্যাদি। ঢালাই ঘড়া আরও অনেক জায়গায় তৈরি হয়। যেমন আরামবাগ, মেদিনীপুরের ঘাটাল, বালিদেওয়ানাগঞ্জ, মানিকপাট, রমজানপুর-এ। বীরভূমের কেঁদুলির পশ্চিমদিকে টিকড়াবেতা গ্রামও ঘড়া তৈরির জন্য বিখ্যাত। ঘাটালে বদনা গাড়ুও তৈরি হয়। শহরে বা স্বাস্থ্য সচেতন গ্রামবাসী কজন আর এখন ঘড়ার ব্যবহার করে। সেখানে ঘড়ার জায়গা এখন দখল করেছে ফিল্টার। তাতে জল কতটা জীবানু বা ক্ষতিকর পদার্থমুক্ত হয় সে সন্দেহ থেকেই যায়।

খাগড়ার কাঁসার খ্যাতি বরাবর। এখনও সেখানে তৈরি হয় কাঁসার থালা, বাটি গ্লাস। নদিয়ার মুড়াগাছাতেও তৈরি হয় গ্লাস ও বাটি। 'বগিথালা'র নাম সকলেই জানেন। একটু কানা উঁচু বগিথালাকে বলা হয় 'কাঞ্চুনে থালা'। আছে 'ভুবনেশ্বরী থালা'। একটু বেশি কানা উঁচু ছোটো থালা যার নাম 'কাঁসি', মুড়ি খাওয়ার জন্য ব্যবহার হয়। একটু বড়ো কাঁসিতে রান্না তরকারি রাখা হয়। ছোটো বগি আর কাঁসির মাঝামাঝি আকৃতির 'বেলুঞ্চি' বাংলাদেশে নাকি বেশি ব্যবহার হয়। 'সাচরী'-তে মুড়ি খেয়েছি– একে কাঁসার-ই পরিবর্তিত রূপ বলা যা?। গল্প শুনেছি আগে কোনো বাড়িতে ডাকাতির সময় নাকি একজন সর্দার শ্রেণির ডাকাত এক গোছা বগি থালা নিয়ে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ডিসকাস ছোঁড়ার মতো মাঝে মাঝে ছুঁড়ত যাতে বাড়ির কাছাকাছি কেউ না এগোয়।

বাঁকুড়ার পাত্রসায়রে তৈরি হয় ঝিনুক, প্রদীপ, গ্লাস, হামানদিস্তা। জনসাধারণ যাতে বিজ্ঞান সচেতন হয়ে বৈজ্ঞানিক মতবাদ অনুসারী রাজনৈতিক দলের ছত্রয়ায়ায় আশ্রয় নেয় সেজন্য গ্রামে-গঞ্জে বিজ্ঞানমঞ্চের আন্দোলন চললেও মাদুলি-তাবিজের ব্যবহারে কমতি নেই। এই মাদুলি তৈরি হয় বিষ্ণুপুরে। বিষ্ণুপুরে অবশ্য বাটিও তৈরি হয়। পূর্ববাংলা থেকে আসা কাঁসারিরা বালির নিশ্চিন্দা কলোনি, উত্তর ২৪ পরগণার দত্তপুকুরে চাদরের ঘড়া, ঘটি, পুষ্পপাত্র, প্রদীপ, হাঁড়ি ইত্যাদি তৈরি করে। বাংলাদেশের লোক একধরণের হাঁড়ি ব্যবহার করে তার নাম 'হাঁড়ি, যা এখন দত্ত পুকুরে তৈরি হয়। এ-কথা বলা হচ্ছে না যে বাংলাদেশের সব লোক ঐ হাঁড়ি ব্যবহার করে বা তৈরি হয় শুধু ঐ জায়গাতেই যেখানে যেটা চালু বা বিখ্যাত তার উল্লেখ করা হচ্ছে। গৃহস্থ বাড়িতে পানের বাটা এবং তার উপরে ঢাকায় সুপুরি ইত্যাদি পান-মশলা রাখা বাটির বহুল

ব্যবহার ছিল। আগে জ্বর হলে রীতিমত তোতো মিক্‌চার - পুরিয়া খেতেই হোত। সেই কারণেই কিনা জানি না রোগীরা প্রচুর থুতু ফেলত। জ্বর হলে রোগীর বিছানার পাশে এটা পিকদানি বসিয়ে দেওয়া হত। মিক্‌সচার-পুরিয়ার যুগ অতীত হওয়ায় এখন বোধহয় রোগীরা আর তেমন থুতু ফেলে না। থুতু ফেলা বা পানের পিক ফেলার জন্য পিতলের পিকদানির ব্যবহার তেমন দেখা যায় না।

নদিয়ার মাটিয়ারী উল্লেখ আগে করা হয়েছে। এখানে তৈরি হয় নানা ছাঁদের হাঁড়ি, যেমন—বাংলা হাঁড়ি, অনসিক হাঁড়ি, প্রায় হাঁড়ির মতো দেখতে বলে বিভিন্ন নামের এইসব বাসনের ছবি দেখাতে পারলে আকারের তফাৎটা বোঝা যেত। যেমন বহু ধরণের ঘটি— হাম্পু ঘটি, কার্শিয়াল ঘটি, জৌনপুরী ঘটি, মির্জাপুরী ঘটি, পাটনাই ঘটি। অপেক্ষাকৃত ছোটো আকৃতির ঘটি সদৃশ তেলের ভাঁড়ের ব্যাপক ব্যবহার ছিল— 'গাছ' ভাঁড়, 'বীট' ভাঁড় ইত্যাদি নাম। বর্ধমানের কৈতায়ার তৈলি হয় তেলের ভাঁড়, হাম্পু ঘটি, হামান দিস্তা। যে কোনো লোকের তাম্বুল বিলাসের জন্য পিতলের হামানদিস্তার প্রয়োজন হয়।

পুজোতে ব্যবহার হয় রেকাবির চেয়ে বড়ো— 'পরাত' যা উত্তর প্রদেশের মীর্জাপুরে তৈরি হয়। বাংলা- পরাত তৈরি হয় মাটিয়ারীতে। পুষ্পপাত্র তৈরি হয় দত্তপুকুর (উঃ ২৪ পরগণা), বালি নিশ্চিন্দা কলোনিতে। কাটোয়ার তৈরি পুষ্পপাত্র ওজনে ভারী, তেমন ছিমছাম নয়। পিতলের মূর্তি তৈরির জন্য নাম আছে নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনের।

মোরাদাবাদে বহুরকমের নক্‌সা করা ধাতুপাত্র, ফুলদানি ইত্যাদির বিশাল মোকাম। পিতল তৈরি হয় তামা ও দস্তার সংমিশ্রণে। তামা ও রাঙের সংকর হল কাঁসা। কাঁসা আর পিতলের মাঝামাঝি সংকর ধাতুর বাসনের চলতি নাম 'ভড়ং'— কে কাঁসার বিকল্প বলা যায়— ঘটি, বাটি, গ্লাস ইত্যাদি তৈরি হয়।

বর্তমানে কাঁসার দাম ৮০০ থেকে ৯০০ টাকা প্রতি কেজি। পিতল ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা প্রতি কেজি, তামা ৬০০ থেকে ৭০০ টাকা প্রতি কেজি, পুরোনো প্রথা মেনে একটা বিয়ের দান কিনতে ৭০০০ থেকে ১৫০০০ টাকা খরচ। এখনও অনেক অনাধুনিক গৃহস্থ কন্যার বিবাহোপলক্ষে এই খরচ করে থাকেন।

বলাবাহুল্য, এই নিবন্ধে বাসন সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে তা নিতান্ত অসম্পূর্ণ। পশ্চিমবাংলার একটি জনপদের বাসিন্দার সামান্য অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। যোগ্য ব্যক্তি ইচ্ছা করলে এ-সম্পর্কে আরও তথ্যনির্ভর প্রামাণ্য নিবন্ধ উপহার দিতে পারবেন। মূলত এটিও গ্রামীণ কুটির শিল্প এবং অন্যান্য অনেক কুটির শিল্পের মতো এটিও হয়তো লুপ্ত হবে বা কোনোরকমে না-মরে বেঁচে থাকবে। স্বল্প বিদ্যাবুদ্ধি নিয়ে, আশেপাসে গাঁ-গঞ্জে দেখাশোনার অভিজ্ঞতায় গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ে মন্তব্য করা সমীচীন নয়। সুবিধার মধ্যে, আমাদের কথা কেউ বড়ো একটা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। গ্রামের মানুষের নিত্যব্যবহার্য জিনিস গ্রামেই পুরুষানুক্রমে ব্যক্তিগতভাবে বহু পরিবার তৈরি করত। এখন আর গ্রামের কামার কোদাল, কাস্তে তৈরি করে না। 'টাটা' ছাপ- দেওয়া কোদাল গ্রামের চাষি শহর-গঞ্জ থেকে কিনে আনে। সময়ের সঙ্গে হয়তো এটা অনিবার্য ছিল। গ্রামের কামার, কুমোর, ছুতোর, তন্তুবায় ইত্যাদি গ্রামীণ কুঠির শিল্পে নিয়োজিত পরিবারগুলি হয়তো খুব স্বচ্ছল জীবন যাপন করত না, কিন্তু দীন হলেও হীন ছিলেন না। বৃহৎ শিল্প বা বৃহৎ পুঁজির বিকাশ হল কিন্তু ঐসব পরিবারগুলির বিকল্প আয়ের পথ তেমন বোধহয় হল না। এরা হয়ে গেলেন প্রান্তিক চাষি বা ভূমিহীন ক্ষেতমজুর, সরকারের দাক্ষিণ্য প্রার্থী— বর্তমানে একশো দিনের কাজের মজুর। ব্যতিক্রম হয়তো আছে কিন্তু তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। সময়কে পিছিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। কিন্তু এগিয়ে কতিপয়ের বাড়-বাড়ন্ত হলেও অধিকাংশের কী হাল সেটাও বিবেচনাযোগ্য।